দৈনিক সংবাদ

JAN. 2 0 2001

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার পথিকৃত

প্রফেসর মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন

১.০ বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বাংলাদেশের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার স্নাতক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যেখানেই রয়েছেন বয়ে এনেছেন দেশের সুনাম। তারা খ্যাতি অর্জন করেছেন। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাধারীদের এ বিদ্যাপীঠে আসা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখুঁত ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল পরীক্ষা পদ্ধতি দেশের সকলেরই গর্ব। কয়েকদিন পূর্বে ঢাকায় এনআরবি 'নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশীদের' সংগঠন 'টেকবাংলার' উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথেয়তায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল Tech-Transfer 2000 BD সেমিনার। সেমিনারে আগত বিদেশী বাংলাদেশীরা ভিক্ষা নয় প্রযুক্তি (Technology not aid) নীতি নিয়ে দেশের উন্নয়নে শরিক হতে চায়। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছে নতুন নতুন বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প, যা তারা নিজেরাই সুদূর প্রবাসে গবেষণার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে অধিকার করেছেন। এজন্য তারা সেমিনারে মিলিত হয়েছেন উদ্যোক্তাদের সাথে, প্রযুক্তিবিদদের সাথে, গবেষকদের সাথে।

এ সেমিনারে আগত প্রায় ৯০ জন প্রবাসীর সিংহভাগই প্রকৌশলী। এ সেমিনারে বুয়েটের প্রাক্তন ছাত্র ড. আবদুল হাই, ড. সাইফুর রহমান, ড. মাহবুবুল হক, ড. ফারুকসহ অনেকের প্রবন্ধ মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রতিটি অংশগ্রহণকারীই নিঃশব্দ নীরবতার মাঝেই শুনছিল। তাদের উন্নতি, তাদের বর্তমান অবস্থান এবং আমেরিকার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে তাদের অবদান-কর্মকাণ্ড শুনে শুনে বুক ভরে উঠছিল। এ ক্ষেত্রে প্রতিবারই মনে হয়েছে আমাদের গর্ব বুয়েট, আমাদের স্বপ্ন আমাদের বুয়েট। সেমিনারে উদাহরণে বলা হয়েছে কিভাবে ভারতের আইআইটির গ্রাজুয়েটরা প্রবাসে থেকে ব্যবসা- বাণিজ্য, আইটি নির্ভর প্রকল্পে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের সময় যখন ভারত সরকার আইআইটির ছাত্রদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন তাদের প্রবাসী গ্রাজুয়েটরা অনুভব করেছে তাতে তাদের গরিব মেধাবি ছাত্ররা আর আইআইটিতে আসতে পারবে না। তজ্জন্য তারা সকলে মিলে লাখ লাখ ডলার চাঁদা তুলে তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এগিয়ে এসেছে। এই ভারতের মাটিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো এশীয় অঞ্চলের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, তাতেও বাংলাদেশের বুয়েটের সোনার ছেলেরা গতবারের মতো প্রথম স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এ প্রকৌশল শিক্ষার বিদ্যাপীঠ বুয়েটের ছাত্র পৃথিবীর কোথায় নেই? পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রয়েছে বুয়েটের স্নাতকরা।

২.০ বুয়েটকে প্রকৌশল শিক্ষার এ সাফল্যজনক অবস্থানে আসতে অনেক শ্রমসাধ্য পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। প্রায় ১২৫ বছর আগে ১৮৭৬ সালে কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকরা ঢাকা সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯০৮ সালে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। ব্রিটিশ সরকার এবং নবাব স্যার আহসান উল্লাহর অদম্য ইচ্ছা এবং একান্ত আগ্রহের কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছিল। দক্ষ ও পেশাদার প্রকৌশলী তৈরির লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ৪ বছর মেয়াদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্স কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল।

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের এ অংশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বর্তমান বাংলাদেশে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সের সাথে সাথে ৪ বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্সের অধীনে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল কার্যক্রম চালু করে। দক্ষ শিক্ষক এবং যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা কেটে উঠে এটি ১৯৫০ সাল নাগাদ সফলভাবে যাত্রা শুরু করে। কলেজটি ১২০ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৫৬ সালে আরও উন্নয়নের মাধ্যমে ছাত্র সংখ্যা ২৪০-এ উন্নীত করা হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে অনুমোদন দেয়। ১৯৫৬ সালে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কারিকুলাম এবং সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়। এ সময়ে চার বছরমেয়াদি কোর্সকে আটটি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়। ডিপ্লোমা কোর্সের ধারাটি বন্ধ করে তা তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরিত করা হয় এবং কেমিকৌশল ও ধাতব কৌশল নামে দুটি পৃথক বিভাগ চালু করা হয়।

১৯৫৪ সালে আমেরিকার ইন্টার-ন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যাডমিনি-স্ট্রেশন (USAID)-এর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের 'টেক্সাস এ এন্ড এম কলেজ'-এর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এশিয়া ফাউ-ন্ডেশনের দেয়া বইয়ের মাধ্যমে এর লাইব্রেরিও সমৃদ্ধ হয়।

১৯৬০ সালের মধ্যে কলেজটি সুসংগঠিত হয় এবং তা উন্নত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার XXXVI নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদার নিরিখে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করে আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং রিসার্চ কার্যক্রম চালু করে। ফলে দেশের উন্নতি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময়ে ছাত্র সংখ্যাও ৩৬০ জনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৬২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি হিসেবে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ইউনি-ভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি হিসেবে নামে তাকে অবহিত করা হয়। ১৯৬৮ সালে USAID এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিসমূহের উন্নতির জন্য অনুদান দেয়। তখন উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেত তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ল্যাবরেটরিগুলোর উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে ৮০ দশকের মাঝামাঝিতে জাপান সরকার, CIDA এবং অন্যরা ল্যাবরেটরি-গুলোর উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৫টি অনুষদের অধীনে ১১টি আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং ১৫টি পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু আছে। ১৯৬০ সাল নাগাদ ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও কারিগরি শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। প্রথম দিকে স্থাপত্য বিভাগেই ছাত্রী আসত, কিন্তু ১৯৬৪ সালে ২ জন ছাত্রী প্রকৌশলে ভর্তি হয় যারা ১৯৬৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্রের প্রায় ১৬% ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। প্রথম ব্যাচের ছাত্রীদের একজন বর্তমানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন।

৩.০ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ের ৬টি ব্যাচে মোট ৪২০৫ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ে এ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৩০১০ জন। মোট গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পিএইচডি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭২ জন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২-২০০০ সাল পর্যন্ত জন প্রায় ১৬ হাজার বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, ১১৫৪ জন এমএসসি/ এম ইঞ্জিনি-য়ারিং, ৯২ জন এমফিল এবং ২৫ জন পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছে। এছাড়া স্থাপত্য বিভাগে প্রায় ৯৫০ জন বিআর্ক ডিগ্রি লাভ করেছে।

বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলীর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৫০৩টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে ৩৪০ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ১৩১ জন শিক্ষক বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং ছুটিতে রয়েছে। মোট শিক্ষকের মধ্যে ১৯৯ জন (৫৯%) পিএইচডি ডিগ্রিধারী।

বিভাগওয়ারী শিক্ষকদের তালিকা নিচের ছকে দেয়া হলো ঃ

বিভাগের নাম	পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা	মোট শিক্ষকের সংখ্যা (ছুটিসহ)
কেমি কৌশল	৮	২৯
ধাতব কৌশল	১০	১৮
রসায়ন	১০	১৪
গণিত	৩	১৬
পদার্থবিদ্যা	৯	১৫
পিএমআরই	৩	৫
পুরকৌশল	৫২	৮১
পানি সম্পদ কৌশল	৯	২৫
মধু কৌশল	২৪	৫৮
নৌ স্থাপত্য এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	৪	১৮
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং	৮	১৬
তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল	২৫	৮২
কম্পিউটার কৌশল	৬	৩৮
আর্কিটেকচার	৭	৩৫
ভূ-তত্ত্ববিজ্ঞান	২	১২
নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা	৭	১২
এক্সটেন্ডেড	৯	১৩
ইনস্টিটিউট এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি	৩	৪

বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটির শিক্ষকদের দিক বিবেচনায় তাকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম উন্নত ফ্যাকালটি হিসেবে অবহিত করা যায়।

এ সকল শিক্ষকের আন্তরিকতা, সততা, ত্যাগ, উদারতা এবং ঐক্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সম্পদ। তারা নিবেদিতপ্রাণ। তারা দেশের জটিল প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসিত হয়েছে।

৪.০ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুয়েট প্রতিনিয়তই সিলেবাস, কোর্স, কারিকুলাম চাহিদার নিরিখে হালনাগাদ করছে। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল কোর্সগুলো আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে কিছু কিছু ঘাটতিও রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান ও মানবিকের কোর্সগুলো শক্তিশালী করার উদ্যোগ রয়েছে। বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান কোর্সগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.০ পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য BUET-এ গবেষণা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ গবেষণালব্ধ কাজ ও ফলাফল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

যদিও পূর্বের তুলনায় বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ ব্যাপারে সরকারের উচিত বুয়েটকে অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া এবং R&D activities শক্তিশালী করা। তা না হলে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী 'জ্ঞান ভিত্তিক' সমাজ বা 'মেধা ভিত্তিক' সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমরা পিছিয়ে পড়ব, পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ব।

৬.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতিতে একুশ শতকের প্রকৌশলীদের জীবন বিরাট পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। কারিগরি জ্ঞানের ধারণা ১৯০০ সালে যা ছিল ১৯৫০ সালে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে ছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সালে এটি বেড়ে আবার দ্বিগুণ হয়। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তা বেড়ে চার গুণে দাঁড়ায়। নব্বই দশকে কারিগরি জ্ঞান আট গুণ বৃদ্ধি পায়। সত্যি কথা বলতে কি আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাস করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে প্রকৌশল কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত।

৬.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রকৌশল শিক্ষাকে প্রভাবিত করে ক. প্রযুক্তির নতুন নতুন পদ্ধতি। খ. জাতীয় চাহিদা। গ. দেশের প্রযুক্তিগত এবং শৈল্পিক অবস্থা। ঘ. গ্লোবা-লাইজেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ।

৬.২ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে ক. গ্লোবাল কমিউ-নিকেশন এবং নেটওয়ার্কিং। খ. রোবট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। গ. মাইক্রো-সিস্টেম টেকনোলজি। ঘ. জেনারেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং। ঙ. সিমুলেশন টেকনোলজি এবং ভারচুয়েল রিয়ালিটি। চ. উন্নত ব্যবহারী বস্তু। ছ. বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। স্পেস (Space) টেকনোলজি।

৬.৩ ইমাজেং ট্রেন্ডসসমূহের মধ্যে আসছে ক. পেপার লেস অফিস। খ. শিক্ষা এবং গবেষণা-বহির্ভূত কার্যক্রম হ্রাস। গ. কাজের জটিলতা বৃদ্ধি। ঘ. মাল্টি ডিসিপ্লিনারির গুরুত্ব বৃদ্ধি। ঙ. গ্লোবাল কমিউনিকেশন ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। চ. সিস্টেমের flexibility। ছ. সামগ্রিক বৃদ্ধি।

৬.৪ পেশাগত জীবনে প্রভাব ক. অধিকাংশ প্রকৌশলী কাজে নিয়োজিত থাকবে। খ. নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন যাতে নির্দিষ্ট অফিসের প্রয়োজন না হয়। গ. কাজের ধরন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হবে সাব কন্ট্রাক্টিং ও দক্ষতা অনুযায়ী। ঘ. স্থায়ী চাকরি ও অবসর গ্রহণের নিয়ম থাকবে না। ঙ. ক্রমাগত নতুন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা অর্জন। চ. দলবদ্ধভাবে কাজ করা ইত্যাদি।

৬.৫ আগামীতে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রে যেখানে কাজের ধারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন আসবে তা হলো ঃ ক. ম্যানুফ্যাকচারিং। খ. কমিউনিকেশন। গ. বায়োটেকনো-লজি। ঘ. আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স এবং রোবটিকস। ঙ. ইনফরমেটিকস।

৭.০ চাহিদার ভিত্তিতে প্রকৌশল শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শুরুতে কর্মসংস্থান সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সরকারি পর্যায়ে কিন্তু বর্তমানে এ ধারণাটি পালটে গেছে। কাজেই আত্ম-কর্মসংস্থান, বাণিজ্য, উদ্যোক্তা, বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বিশ্ববাজারের উপযোগী করে প্রকৌশলীদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে অর্থনীতির বাজারে যেমনি উৎপাদিত পণ্যকে বাজার পেতে হয় তেমনি প্রকৌ-শলীদেরও বাজারে তাদের চাহিদা তৈরি করে নিতে হবে। তাই এর ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যসূচি পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে অব্যাহত প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি। আগামীতে একজন প্রকৌশ-লীকে তার কর্মময় জীবনে ৭-১০ বার অব্যাহত প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এ শিক্ষা ক্লাস রুম থেকে দূরশিক্ষণ পর্যায়েও থাকবে। বুয়েট ইতোমধ্যেই অব্যাহত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর স্থাপন করেছে।

৮.০ আধুনিক পদ্ধতিতে ছাত্ররা শিক্ষা উপকরণ হিসেবে Software, computers, programmable calculators, informatics, internet প্রভৃতি ব্যবহার করছে। এসবের মূল ভিত্তি জানবার ক্ষেত্রে ছাত্রদের ওপর চাপ থাকা প্রয়োজন। এমনি ব্যবস্থার মাধ্যমেই সঠিক মূল্যায়িত প্রযুক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নতুবা ছাত্রদের জ্ঞানের ভিত্তি শুধু Software সমূহের ওপরই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভিত্তিক সহজবোধ্য নীতিমালা প্রণয়ন। সৃষ্টিশীলতা বা নতুন কিছু করার প্রবণতা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন সমস্যা বা পদ্ধতিভিত্তিক অনুশীলন বা নতুন কিছু করার প্রবণতা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন সমস্যা বা পদ্ধতিভিত্তিক অনুশীলন। পণ্য তৈরি, পণ্য উন্নয়ন, শিল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যম— উৎপাদন প্রকৌশলের প্রতি জোর দিতে হবে। বর্তমানেও পুনঃ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা অর্থাণ্ড। প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও সংস্কার প্রয়োজন। তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নতির জন্য উন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম প্রযুক্তি জ্ঞান প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশে তা নেই। উন্নত দেশগুলোর মতো এক্ষেত্রে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিকায়ন সম্পর্কিত। স্বনির্ভরতা ও আধুনি-কায়নের জন্য ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন প্রয়োজন। কম্পিউটার সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও যথাযথ টেলি-যোগাযোগের মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারগুলোকে কম্পিউটারায়ন ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। কারিগরি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন নতুন নতুন প্রযুক্তি ও ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে হবে ও সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কেও মাল্টি মিডিয়াভিত্তিক পড়াশোনার ব্যবস্থাদি করতে হবে।

৯.০ কারিগরি শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। উচ্চমান অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে এখন শুধু উৎপাদনশীলতাই প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্ক দক্ষ জনশক্তি। বিশ্বমানের মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরির জন্য প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে প্রয়োজন উচ্চ মেধাসম্পন্ন নারী পুরুষ। এ আলোকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে (বুয়েট) একবিংশ শতাব্দীর নিরিখে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সক্রিয় সরকারি সহযোগিতা।